নবায়নযোগ্য জ্বালানি : কতটা পিছিয়ে বাংলাদেশ?

মওদুদ রহমান

বাংলাদেশ নবায়নযোগ্য জ্বালানি ব্যবহারের অসীম সম্ভাবনা ধারণ করে আছে। অর্ধেকেরও বেশি জনগোষ্ঠীর বিদ্যুৎ সুবিধাহীন জীবনযাপন দেশজুড়ে নবায়নযোগ্য জ্বালানি সম্প্রসারণের ব্যাপক সুযোগ সৃষ্টি করেছে। স্থলভাগে প্রায় শেষ হয়ে আসা গ্যাস রিজার্ভ, অতি সামান্য তেল এবং কয়লার জোগান, সেই সাথে বাড়তে থাকা আমদানিকৃত জ্বালানি ব্যয় নবায়নযোগ্য জ্বালানি ব্যবহারের তীব্র চাহিদা তৈরি করেছে। আর বিশাল উদ্যমী শিক্ষিত তরুণ সমাজ গবেষণা এবং বাজার সম্প্রসারণের মাধ্যমে এ খাতের টেকসই ভিত্তি প্রদানে তৈরি হয়ে আছে। পৃথিবীর অনেক দেশই এসবের তুলনায় অনেক কম সুবিধা থাকা সত্ত্বেও শুধুমাত্র দূরদর্শিতার কারণে অনেক দূর এগিয়ে গেছে। কিন্তু নীতিনির্ধারণী অজ্ঞতা, সরকারি বিনিয়োগের অভাব, কতিপয় দেশি বিদেশি গোষ্ঠীর স্বার্থরক্ষার চেষ্টা, ঘোষিত লক্ষ্যমাত্রার নিয়ত পরিবর্তন আর বাস্তবভিত্তিক করণীয় ঠিক না করতে পারার কারণে নবায়নযোগ্য জ্বালানি খাত উন্নয়নে সামগ্রিক বিচারে আমরা যে শুধু স্থবির হয়ে আছি তা-ই নয়, বরং বৈশ্বিক বিচারে আমরা ক্রমাগত পিছিয়ে পড়ছি।

নীতিমালাকেন্দ্রিক অব্যবস্থাপনা

যে কোনো খাতের সুষ্ঠু বিকাশের অন্যতম প্রধান শর্ত হচ্ছে সঠিক নীতিমালা প্রণয়ন। সরকার ঘোষিত সুষ্ঠু নীতিমালা একদিকে যেমন বাস্তবতার প্রতিফলন ঘটায়, অন্যদিকে বিনিয়োগ আকৃষ্ট করে, সরকারি-বেসরকারি বিভিন্ন সংস্থা কর্তৃক গবেষণা ও মানোন্নয়নের নিশ্চয়তা প্রদান করে, আর সেই সাথে সকলকে কোনো বিশেষ খাত সম্প্রসারণে উৎসাহ প্রদান করে। অন্যান্য দেশ যেখানে বাস্তবভিত্তিক নীতিমালা প্রণয়ন করে নবায়নযোগ্য জ্বালানিকে জীবাশ্ম জ্বালানি ব্যবহার ব্যবস্থার সাথে সমন্বয় করে ধীরে ধীরে একে ভবিষ্যতের জন্য প্রস্তুত করে তুলছে, ঠিক সেই সময়ই বাংলাদেশ নবায়নযোগ্য জ্বালানি ব্যবস্থাপনায় এক বিশৃঙ্খল পরিবেশ তৈরি করে রেখেছে। জ্বালানি নীতিমালাগুলোতে না আছে কোনো ধারাবাহিকতা, না আছে কোনো গবেষণার ছাপ, না আছে কোনো বাস্তবতার প্রতিফলন। জ্বালানি নীতিমালাগুলো একটু গভীরভাবে পর্যালোচনা করলে এবং একটির সাথে আগেরটির তুলনা করলে নীতিগত অসঙ্গতি ফুটে ওঠে পরিষ্কারভাবে।

উদাহরণস্বরূপ ১০০ মেগাওয়াট ক্ষমতার বায়ুবিদ্যুৎ প্রকল্পটির কথা উল্লেখ করা যায়, যেটি ২০১০ সালের ঘোষিত লক্ষ্যমাত্রা অনুসারে ২০১২ সালের জুন মাসের মধ্যেই উৎপাদনে আসার কথা ছিল। কিন্তু ২০১১ সালে একটি পুনর্ঘোষণা দেয়া হয়, যা অনুযায়ী সেটি স্থাপনের লক্ষ্য নির্ধারণ করা হয় ২০১৩ সালের জানুয়ারি মাসের মধ্যেই। কিন্তু কাজের এতটুকুও অগ্রগতি না হওয়ায় ২০১২ সালে আরেকটি পুনর্ঘোষণা দেয়া হয়, যা অনুযায়ী সেটি স্থাপনের লক্ষ্য নির্ধারণ করা হয় ২০১৫ সালের মার্চ মাস। এই ধারাবাহিকতায় আর কাজের অগ্রগতি বিবেচনায় কারোরই বুঝতে অসুবিধা থাকার কথা নয় যে, এই প্রকল্প আগামী বেশ কয়েক বছর পর্যন্ত কেবল ঘোষণা-পুনর্ঘোষণার মধ্যেই সীমিত হয়ে থাকবে।

জ্বালানি খরচ : ধনীর কম, গরিবের বেশি

ইডকলের হিসাব অনুসারে বাংলাদেশে এ পর্যন্ত প্রায় ৩০ লাখ সোলার হোম সিস্টেমের ব্যবহার নিশ্চিত করা সম্ভব হয়েছে, যার মোট উৎপাদন সক্ষমতা প্রায় ১৩০ মেগাওয়াট। এর ব্যবহারকারীরা প্রায় সবাই গ্রামাঞ্চলের বাসিন্দা, যেখানে বেশিরভাগ মানুষই দরিদ্র। অথচ সারাদিনে মাত্র ৩-৪ ঘণ্টা বিদ্যুৎ ব্যবহারের জন্য ৪০ ওয়াট ক্ষমতার সোলার হোম সিস্টেম বসাতে খরচ

ছক ১: নবায়নযোগ্য জ্বালানিভিত্তিক প্রকল্পগুলোর বেহাল দশা [১] [২] [৩]

২০১০ সালে ঘোষিত লক্ষ্যমাত্রা		
প্রকল্প	*উৎপাদন লক্ষ্যমাত্রা (বাস্তবায়নকারী সংস্থা)*	*লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ*
কাপ্তাই সৌরবিদ্যুৎ	৫ মেগাওয়াট (বিপিডিবি)	জুন ২০১২
সৌরবিদ্যুৎ	৭ মেগাওয়াট (আইপিপি)	জানুয়ারি ২০১২
বায়ুবিদ্যুৎ	১০০ মেগাওয়াট (আইপিপি)	জুন ২০১২
২০১১ সালে পুনর্ঘোষিত লক্ষ্যমাত্রা		
প্রকল্প	*উৎপাদন লক্ষ্যমাত্রা (বাস্তবায়নকারী সংস্থা)*	*পুনঃ লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ*
কাপ্তাই সৌরবিদ্যুৎ	৫ মেগাওয়াট (বিপিডিবি)	ডিসেম্বর ২০১২
সৌরবিদ্যুৎ	৭ মেগাওয়াট (আইপিপি)	জুন ২০১২
বায়ুবিদ্যুৎ	১০০ মেগাওয়াট (আইপিপি)	জানুয়ারি ২০১৩
২০১২ সালে পুনর্ঘোষিত লক্ষ্যমাত্রা		
প্রকল্প	*উৎপাদন লক্ষ্যমাত্রা (বাস্তবায়নকারী সংস্থা)*	*পুনঃ লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ*
কাপ্তাই সৌরবিদ্যুৎ	৫ মেগাওয়াট (বিপিডিবি)	সেপ্টেম্বর ২০১৪
সৌরবিদ্যুৎ	৭ মেগাওয়াট (আইপিপি)	জানুয়ারি ২০১৫
বায়ুবিদ্যুৎ	১০০ মেগাওয়াট (আইপিপি)	মার্চ ২০১৫

ছক ২: সরকারি নীতিমালায় বিভিন্ন সময়ে ঘোষিত লক্ষ্যমাত্রা

গাল	*জ্বালানি নীতিমালা*	*লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ*
২০০৪	জ্বালানি নীতি ২০০৪	নবায়নযোগ্য জ্বালানিভিত্তিক বিদ্যুৎ উৎপাদন ২০১০ সালের মধ্যে কমপক্ষে শতকরা ৫ ভাগ এবং ২০২০ সালের মধ্যে হবে ১০ ভাগ
২০০৫	নবায়নযোগ্য জ্বালানি নীতি ২০০৫ (ড্রাফট)	২০১০ সালের মধ্যে কমপক্ষে শতকরা ৫ ভাগ এবং ২০২০ সালের মধ্যে উৎপাদন ক্ষমতা হবে শতকরা ১০ ভাগ
২০০৮	নবায়নযোগ্য জ্বালানি নীতি ২০০৮	২০১৫ সালের মোট বিদ্যুৎ চাহিদার শতকরা ৫ ভাগ উৎপাদিত হবে নবায়নযোগ্য জ্বালানি হতে এবং ২০২০ সালে তা বেড়ে দাঁড়াবে ১০ ভাগে
২০১০	বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা ২০১০	২০১৫ সালের মোট বিদ্যুৎ চাহিদার শতকরা ৫ ভাগ উৎপাদিত হবে নবায়নযোগ্য জ্বালানি হতে এবং ২০২০ সালে তা বেড়ে দাঁড়াবে ১০ ভাগে
২০১২	বাজেট বক্তৃতা ২০১১-১২	২০১৫ সালের মোট বিদ্যুৎ উৎপাদনের শতকরা ৫ ভাগ আসবে নবায়নযোগ্য জ্বালানি খাত হতে এবং ২০২০ সালে তা বেড়ে দাঁড়াবে ১০ ভাগে
২০১৩	বাজেট বক্তৃতা ২০১২-১৩	২০২০ সালের মধ্যে নবায়নযোগ্য জ্বালানিভিত্তিক বিদ্যুৎ উৎপাদন হবে ৫০০ মেগাওয়াট (এটি ২০২০ সালের বিদ্যুৎ উৎপাদন লক্ষ্যমাত্রার মাত্র ২.৫ ভাগ)
২০১৪	নবায়নযোগ্য জ্বালানি নীতিমালা ২০১৪ (ড্রাফট)	২০১৫ সালের মোট বিদ্যুৎ উৎপাদনের শতকরা ৫ ভাগ আসবে নবায়নযোগ্য জ্বালানি খাত হতে এবং ২০৩০ সালে তা বেড়ে দাঁড়াবে ১০ ভাগে (পূর্বের ঘোষিত লক্ষ্যমাত্রা অনুসারে ২০২০ সালের মধ্যেই ১০ ভাগ বিদ্যুৎ নবায়নযোগ্য জ্বালানি হতে উৎপাদনের কথা ছিল)

করতে হয় প্রায় ১৫-১৮ হাজার টাকা। সেই হিসাবে শুরু থেকেই প্রারম্ভিক খরচ হিসেবে আনলে প্রতি ইউনিটে প্রায় ৬০ টাকা খরচ করে নবায়নযোগ্য শক্তি ব্যবহার করে গ্রামগুলো আলোকিত করছে নিতান্তই অসচ্ছল, গরিব, খেটে খাওয়া মানুষ। সোলার প্যানেল স্থাপনে কিছু ঋণ সাহায্য পাওয়া গেলেও সুদে-আসলে প্যানেল স্থাপন ও রক্ষণাবেক্ষণের পুরো খরচই বহন করছেন প্যানেল ব্যবহারকারী।

এই খরচ বহনের তীব্রতা কতটা তা বোঝা যাবে যদি আমরা চিন্তা করি যে, কোনো তেল বা গ্যাসভিত্তিক বৃহৎ বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্রের স্থাপন, রক্ষণাবেক্ষণ ও চালানোর যাবতীয় খরচ এবং ঝুঁকি আমাদেরই বহন করতে হচ্ছে। শহুরে সচ্ছল মানুষেরা যে দামে বিদ্যুৎ পাচ্ছেন তার চেয়ে কয়েকগুণ বেশি থাকা সত্ত্বেও সৌর বিদ্যুতায়নে এদেশের গ্রামাঞ্চলের মানুষেরা যে অনন্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন তাতেই বোঝা যায় বিদ্যুতের চাহিদা আর নবায়নযোগ্য শক্তি ব্যবহারের তাৎপর্য কতটা তীব্র। অথচ নতুন বিদ্যুৎ সংযোগ পাবার ক্ষেত্রে শতকরা মাত্র ৩ ভাগ বিদ্যুৎ নবায়নযোগ্য শক্তি হতে মেটানোর নিয়মটিকে শহুরে মানুষেরা অগ্রাহ্য করেছে তীব্রভাবে। সোলার প্যানেল ভাড়া করা, কর্তাব্যক্তিদের ঘুষ দেয়াসহ নেয়া হয়েছে নানা ছলচাতুরীর আশ্রয়। টাকা না থাকার অজুহাতে শিল্প-কারখানা মালিকরা সোলার হিটিং সিস্টেম ব্যবহার করেন না, বায়োগ্যাস ব্যবহার অত্যন্ত সাশ্রয়ী হওয়া সত্ত্বেও কারিগরি ও আর্থিক দিক থেকে কোনো সহযোগিতার সুযোগ না থাকায় আর সেই সাথে নামমাত্র দামে গ্যাস সরবরাহের সুবিধার কারণে নামিদামি হোটেল-রেস্টুরেন্টগুলোর একটিও বায়োগ্যাস উৎপাদনে এগিয়ে আসেনি। অন্যদিকে শ্রীলঙ্কায় বর্জ্য যেখানে-সেখানে ফেলার সুযোগ না থাকায় এবং সরকারি সহযোগিতায় বিভিন্ন সংস্থা আর্থিক ও কারিগরি সুবিধা প্রদান করায় বাণিজ্যিক রেস্টুরেন্টগুলোতে বায়োগ্যাস ব্যবহারের প্রচলন শুরু হয়েছে, যা ধীরে ধীরে গৃহস্থালি ব্যবহার পর্যায়ে ছড়িয়ে পড়ছে। এতে একদিকে যেমন সঠিক বর্জ্য ব্যবস্থাপনায় গতি এসেছে, আমদানি করা এলপিজি গ্যাসের চাহিদা কমছে, অপরদিকে উচ্চমানের জৈব সারের জোগানও বাড়ছে।

তাই এ কথা বলাই যায় যে 'আলোকিত বাংলাদেশ', 'সবার জন্য বিদ্যুৎ' আর নবায়নযোগ্য শক্তির সর্বতো ব্যবহার নিশ্চিতকরণ গরিব মানুষের পকেট কাটা টাকায় হবে না। জ্বালানি স্বনির্ভরতা অর্জনে শহুরে বিত্তবানদেরও অংশ নিতে হবে, যারা মাত্র ছয় টাকা ইউনিটে বিলাসী শীতাতপ নিয়ন্ত্রণ যন্ত্র আর মাইক্রোওয়েভ ওভেন ব্যবহার করছে।

ভ্রান্তিবিলাস

নবায়নযোগ্য জ্বালানি ব্যবহার ব্যয়বহুল বিধায় এর বহুল ব্যবহার সম্ভব নয়– এমন ভ্রান্তিবিলাসে গা ভাসিয়ে দেয়ার কোনো সুযোগ নেই। সৌরশক্তি, বাতাসের গতি কিংবা পানির প্রবাহ–এ সবকিছু আমাদের চারপাশেই বিদ্যমান। শুধুমাত্র প্রয়োজন এর রূপান্তরকরণ। আর যেহেতু এই রূপান্তর সম্পূর্ণভাবে প্রযুক্তিনির্ভর, তাই সময়ের আবর্তনে প্রযুক্তির নিয়ত উন্নতিতে সকল ধরনের নবায়নযোগ্য জ্বালানির ব্যবহার খরচ কেবলই কমছে। ঠিক এ কারণেই সৌরশক্তিকেন্দ্রিক বিনিয়োগ আগের বছরের চেয়ে ২০১৩ সালে ২২ শতাংশ কমে গেলেও নতুন সোলার প্যানেলের ব্যবহার বেড়েছে ৩২ শতাংশ।[৪]

২০০০ সালে বিশ্বে মোট বায়ুভিত্তিক বিদ্যুৎ উৎপাদন যেখানে ছিল ১৭,০০০ মেগাওয়াট, ২০১৩ সালে তা বেড়ে দাঁড়ায় ৩,১৮,০০০ মেগাওয়াটে। অপরদিকে সৌরভিত্তিক বিদ্যুৎ উৎপাদন ২০০০ সালে ছিল ২,৮০০ মেগাওয়াট আর তা ২০১৩ সালে বেড়ে দাঁড়ায় ১,৪২,০০০ মেগাওয়াটে।[৪] এমনিভাবে প্রযুক্তির ক্রমোন্নয়নে কমতে থাকা দামের কারণে বায়োগ্যাস, জিওথার্মাল, টাইডাল, মাইক্রো-পিকো হাইড্রো–এ সব কিছুরই ব্যবহার বেড়ে গেছে কয়েকগুণ। এই ক্রমবৃদ্ধির হার বিশ্লেষণ করে দেখা গেছে যে, ২০৩০ সালের মধ্যেই সৌর ও বায়ুভিত্তিক বিদ্যুৎ উৎপাদন বেড়ে দাঁড়াবে যথাক্রমে ৫,৮০,০০০ মেগাওয়াট এবং ১৭,৬৮,০০০ মেগাওয়াটে।[৫]

অন্যদিকে বর্তমানের ১১০ ডলার ব্যারেলের আমদানীকৃত তেলের দাম ২০৩০ সালের মধ্যেই হবে আকাশচুম্বী আর কমতে থাকা রিজার্ভের কারণে ২০৫০ সালের পর টাকা দিয়েও হয়তো বা তা কেনা যাবে না। গবেষণায় দেখা গেছে যে, ২০২০ সালের পরই আমাদের গ্যাস সংকট প্রকট হয়ে উঠবে আর নতুন কোনো রিজার্ভ আবিষ্কার করা না গেলে ২০৩০ সালের পর আমাদের কোনো গ্যাসের উৎপাদন থাকবে না। অন্যদিকে ইউরোপীয় ইউনিয়নভুক্ত দেশগুলোর নবায়নযোগ্য জ্বালানি কেন্দ্রিক ভবিষ্যৎ নীতিমালা গ্রহণের কারণে ২০২০ সালে জীবাশ্ম জ্বালানিভিত্তিক খরচ কমবে ১৫৮ বিলিয়ন ইউরো, ২০৩০ সালে কমবে ৩২৫ বিলিয়ন ইউরো আর ২০৫০ সালে খরচ কমবে ১০৯০ বিলিয়ন ইউরো।

অর্থ নয়, বরং নীতিমালা প্রণয়ন এবং এর সুষ্ঠু বাস্তবায়নই যে নবায়নযোগ্য জ্বালানি খাত উন্নয়নে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ তা আমাদের পার্শ্ববর্তী দেশ ভারতকে দেখলেই বোঝা যায়। ভারত এরই মাঝে সর্বোচ্চ

নবায়নযোগ্য জ্বালানিভিত্তিক বিদ্যুৎ উৎপাদনকারী দেশগুলোর তালিকায় ষষ্ঠ স্থানে রয়েছে। জলবিদ্যুৎ ব্যতীত এর নবায়নযোগ্য জ্বালানিভিত্তিক বিদ্যুৎ উৎপাদন ২৭,০০০ মেগাওয়াট আর জলবিদ্যুৎসহ তা ৭১,০০০ মেগাওয়াট।[৪]

ছক ৩: কয়েকটি দেশে নবায়নযোগ্য জ্বালানিভিত্তিক বিদ্যুৎ উৎপাদনের শতকরা হার ও ভবিষ্যৎ সম্ভাব্য উৎপাদন।[৪]

দেশ	*বর্তমান শতকরা হার (%)*	*ভবিষ্যৎ উৎপাদন লক্ষ্যমাত্রা (%)*	*বিদ্যুৎ সুবিধার আওতাভুক্ত জনগোষ্ঠী (%)*
বাংলাদেশ	২.৫%	২০১৫ সালের মধ্যে মোট উৎপাদনের ৫% ২০৩০ সালের মধ্যে মোট উৎপাদনের ১০%	৬০%
মালয়েশিয়া	৫%	২০১৫ সালের মধ্যে মোট উৎপাদনের ৫% ২০২০ সালের মধ্যে মোট উৎপাদনের ৯%	১০০%
শ্রীলঙ্কা		২০১৬ সালের মধ্যে মোট উৎপাদনের ১০% ২০২০ সালের মধ্যে মোট উৎপাদনের ২০%	৯০%
থাইল্যান্ড	৭.৬%	২০২১ সালের মধ্যে মোট উৎপাদনের ১০%	৯৯%
সেনেগাল	১০%	২০২১ সালের মধ্যে মোট উৎপাদনের ১৫%	৪২%
তিউনিসিয়া	১.৬%	২০১৬ সালের মধ্যে মোট উৎপাদনের ১৬% ২০৩০ সালের মধ্যে মোট উৎপাদনের ৪০%	৯৯%
সুদান		২০১৬ সালের মধ্যে মোট উৎপাদনের ১০%	২৯%
জার্মানি	২৫%	২০২৫ সালের মধ্যে মোট উৎপাদনের ৪০-৪৫% ২০৫০ সালের মধ্যে মোট উৎপাদনের ৮০%	১০০%
ডেনমার্ক	৪৮%	২০২০ সালের মধ্যে মোট উৎপাদনের ৫০% ২০৫০ সালের মধ্যে মোট উৎপাদনের ১০০%	১০০%

তাই প্রযুক্তির উচ্চমূল্যের কারণে নবায়নযোগ্য জ্বালানি ব্যবহার জনপ্রিয় করা যাচ্ছে না– এমন যুক্তি নীতিনির্ধারকদের অজ্ঞতারই পরিচায়ক। মনে রাখা প্রয়োজন, এদেশে যে প্রায় সোয়া কোটি মানুষ সোলার হোম সিস্টেম ব্যবহার করছেন, তাঁরা কেউই শহুরে সচ্ছল নন, বরং গ্রাম কিংবা মফস্বলে থাকা তুলনামূলক অসচ্ছল মানুষ।

স্নো-বল এফেক্ট

নবায়নযোগ্য শক্তির ব্যবহার হচ্ছে স্নো-বল এফেক্টের মতো। বরফ কুণ্ডলী যেমন করে গড়িয়ে চলার সাথে সাথে আকারে বড় হতে থাকে, ঠিক তেমনি গ্রামের একটি ঘরের সোলার প্যানেলের সুবিধা পুরো গ্রামকে সোলার প্যানেল ব্যবহারে উদ্বুদ্ধ করে। কোনো একটি বাড়িতে বায়োগ্যাসের উৎপাদন আশেপাশের বাড়িগুলোতেও এটি ব্যবহারে আগ্রহ তৈরি করে। এমনিভাবেই তৈরি হয় সক্ষমতা, অর্জিত হয় নবায়নযোগ্য শক্তি ব্যবহারের লক্ষ্যমাত্রা। কারণ নবায়নযোগ্য জ্বালানির যথাযোগ্য ব্যবহার মানে শুধুমাত্র বিদ্যুৎহীন লোকালয়ে সোলার প্যানেল পৌঁছে দেয়া নয়, কিংবা বিচ্ছিন্নভাবে কর্পোরেট প্রোগ্রামের সিএসআরের অধীনে কিছু বায়োগ্যাস প্লান্ট চালু করা নয়। নবায়নযোগ্য জ্বালানিকে অনবায়নযোগ্য জ্বালানির বর্তমান মূল ব্যবস্থাপনা হতে আলাদা করে রাখলে চলবে না। নবায়নযোগ্য জ্বালানি ব্যবহারের সর্বোচ্চ সুবিধা আদায় করতে হলে আবশ্যিক অনুষঙ্গ হিসেবে বন্ধ করতে হবে জ্বালানির অপচয়, বাস্তবায়ন করতে হবে ডিমান্ড সাইড ম্যানেজমেন্ট, নিশ্চিত করতে হবে সকল যন্ত্রাংশের সর্বোচ্চ কর্মদক্ষতা। এসব প্রতিটি ক্ষেত্রেই পিছিয়ে বাংলাদেশ। এখানে গ্যাসভিত্তিক বিদ্যুৎকেন্দ্রগুলো চলছে মাত্র ২৫-৩০ শতাংশ কর্মদক্ষতায়। শপিং মলগুলো গড়ে উঠছে কাচে ঘেরা সম্পূর্ণ শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত পরিবেশে। আর এসি চালিয়ে কর্তাব্যক্তিরা অফিস করছেন কোট গায়ে চেপে কেতাদুরস্ত হয়ে। এমনি যদি চলতেই থাকে তাহলে আমাদের জ্বালানি দারিদ্র্য ঘুচবে না কোনোকালেও, নবায়নযোগ্য জ্বালানি ব্যবহারের অসীম সম্ভাবনা শুধু কাগজেই থাকবে, সবার জন্য বিদ্যুৎ হয়ে থাকবে শুধুই স্বপ্ন।

আমাদের গ্যাস রিজার্ভ কমে আসছে, বিদ্যুৎকেন্দ্রগুলোর নিয়ত বাড়তে থাকা তেলের চাহিদা মেটাতে আমদানি ব্যয় বাড়ছে, কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎকেন্দ্রের জন্য বিতর্কিত স্থান নির্বাচনে ঝুঁকির মুখে পড়েছে সুন্দরবন আর বাড়তে থাকা বিদ্যুতের দামে নাকাল হচ্ছি আমরা। জ্বালানি খাতের এই গভীর ক্ষত যে কুইক রেন্টালের মতো কোনো টোটকা সমাধানে সারবে না তা এরই মাঝে প্রমাণ হয়ে গেছে। এখন সময় এসেছে বর্তমান সংকটকে স্বীকার করে বাস্তবভিত্তিক সিদ্ধান্ত নেয়ার এবং ভবিষ্যৎ জ্বালানি স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জনে নবায়নযোগ্য জ্বালানিকে প্রাধান্য দিয়ে সমন্বিত নীতিমালা প্রণয়নের।

নবায়নযোগ্য জ্বালানি ব্যবহার এখন আর শুধু পরিবেশ রক্ষা আন্দোলনের অংশ নয়, বরং বর্তমান সংকট থেকে উত্তরণের একমাত্র উপায়। এ খাতে বিনিয়োগ-গবেষণা যত দ্রুত শুরু হবে, ততই আমাদের জন্য মঙ্গল। আর তা না হলে পিছিয়ে পড়ব আমরা, হারাব সূর্য-পানি-বাতাসের শক্তি ব্যবহারের সুবর্ণ সুযোগ।

মওদুদ রহমান: প্রকৌশলী ও গবেষক
ইমেইল: mowdudur@gmail.com

তথ্যসূত্র :

১. Bangladesh Economic Review 2010
২. Bangladesh Economic Review 2011
৩. Bangladesh Economic Review 2012
৪. REN21, Renewable Energy Policy Network for 21st Century, Renewables 2014 Global Status Report, pp 1-215
৫. Levelised Cost of Electricity, Renewable Energy Technologies Studz, November 2013, FRAUNHOFER INSTITUTE FOR SOLAR ENERGY SYSTEMS ISE, pp 1-50